শীতলপাটি : মহিলাকটি

ড. শিবশঙ্কর পাল

কুটির শিল্প হিসাবে পাটিশিল্পের পরিচয় আছে। গ্রীষ্মকালে আরাম পেতে শীতলপাটির বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে শীতলপাটি আজও তৈরী হচ্ছে। তবে সরকারী ও দেশবিদেশের নানা প্রকল্প বা সুবিধা প্রাপ্তির প্রতি পাটি শিল্পীদের কিছুটা ক্ষোভ আজও আছে। তবে এসব প্রান্তিক শিল্প দিন দিন কমছে যেন। নতুন মেয়েরা এসব কাজে আসতে চাইছে না। পুরনো দক্ষ শিল্পী বা প্রশিক্ষণের অভাবও এসব শিল্প অবক্ষয়ের একটা কারণ। আগে যে হারে উন্নত মানের পাটি বানানো হতো তার শিল্পীর সংখ্যা কমছে দিনদিন। তাছাড়া বর্তমান শিল্পীরা শীতলপাটির শিল্পগুণ বজায় রাখা অপেক্ষা আয়ের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। ফলে শীতলপাটি বুনলেও তার শিল্প সৌন্দর্য অতটা থাকছে না আর। পাটি বেত কাটা, তার ছাল তোলা, ভাতের ফ্যান দিয়ে সিদ্ধ করা (কেও কেও তেঁতুল পাতা বা লেবুর রস মেশায়), রঙ করা, পাটি বোনা, নকশা তোলা এসব নিয়ে শীতলপাটির কাজটা বেশ সময়সাপেক্ষ। তাড়াতাড়ি বোনার জন্য জমাট ও সূক্ষ্ম বুননের কাজটাও কেও করতে চাইছে না। করলেও সে শিল্পীর সংখ্যা হাতে গোনা। সেই পাটির দাম আবার আকাশ

ছোঁয়া। তাছাড়া বিদেশিরা ছাড়া অত দাম দিয়ে ওসব কিনবে কে? পেট তো চালাতে হবে শিল্পীদের। তাই মোটা বুননের ও কম সময়ের পাটির কাছে সূক্ষ্ম পাটির কাজ তার পুরনো শ্রী হারাচ্ছে দিনদিন। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লক পাটিশিল্প সমবায় সমিতির দেখাশোনা করেন প্রদীপ দে ও রামচন্দ্র পাল। রামচন্দ্র পালের মতে— বাংলাদেশের শিল্পীরা এখানে এসে মোটা পাটির কাজটি কোনমতে তাড়াতাড়ি তুলে দিয়ে বেশ আয় করছে। ফলে সূক্ষ্ম পাটি শিল্পীরা আয়ের জন্য মোটা পাটি তৈরীর দিকে মন দিচ্ছে না। গরিব ঘরের মেয়েরা ছাড়া একটু স্বচ্ছল ঘরের মেয়েরা আবার একাজে আসছে না। ফলে পাটির মান ও শিল্পী সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্য সরকারের পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী টগর রাণী দে'র মতে— 'সরকারী উদ্যোগ থাকলেও তার উপযুক্ত প্রয়োগ, প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার আয়োজন, দক্ষশিল্পী দিয়ে উঠতি স্কুল কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রভৃতির অভাব এই শিল্পের গুণগত মান অবক্ষয়ের কয়েকটি কারণ।' কোচবিহার ১ ও ২ নম্বর ব্লক, তুফানগঞ্জ ১ নং ব্লক, দিনহাটার বহু গ্রামে এখনও পাটি বেতের কাজ হচ্ছে। ওসব এলাকার মহিলারা এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যেমন শঙ্করী দে, চপলা দে, বিউটি দে দেবনাথ পাটি শিল্পের জন্য রাজ্যস্তরে পুরস্কার পেয়েছে। আছে লক্ষী চন্দ্র, গীতা পাল, কল্পনা দত্ত, বীণা ধর, বীণা দের মতো বহু মহিলা শিল্পী। দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই, হরিয়ানা, গোয়ার বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলায় এসব মহিলারা পাটি শিল্পের নমুনা নিয়ে যায়। আয় করে। সাথে নিয়ে যায় শীতল পাটি, মানি ব্যাগ, পাউচ, মোবাইল ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, ট্রে, বড় বক্স, ওয়াটার বোতল ব্যাগ প্রভৃতি। কোচবিহারের ভৌগোলিক পরিবেশে পাটি বেতের গাছ জন্মে। ওই গাছ থেকে বেত তৈরী করা হয়। তা দিয়ে মহিলার তৈরী করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এসব পাটি বা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বুননে এক বিশেষ শৈল্পীক নৈপুন্য আছে। আছে গঠন সৌষ্ঠবের পরিপাটি। পাটিগুলো খুব সুন্দর করে একটার পর একটা ঢুকিয়ে বোনা হয়। তোলা হয় নানা নকশা। বেতের সঙ্গে সাদা বাদামী লীন সবুজ রঙ মেশান হয়। তাতে পাটির উপর ফুটে ওঠে হরেক রঙের বাহার। তবে পাটির গায়ে নকশা তোলা বেশ সময়সাপেক্ষ (এক মাস দেড় মাস পর্যন্ত)। নকশা বা মোটিফ তোলার হিসাব নিকাশ বেশ জটিল। অথচ মহিলারা ওটা খুব নিপুনতার সঙ্গে করে থাকে। ওসব পাটি চটজলদি বোনা যায় না। আবার সূক্ষ-জমাট শীতল পাটি বা সাধারণ পাটি বুনতে সময় লাগে কম। দৈর্ঘ্য প্রস্থ অনুসারে চার পাঁচদিনে বোনা যায়। মিহি হয় সে বুনন। আবার মোটা বুননও হয়। অন্যদিকে নকশা করা পাটিতে বহু পরিশ্রমের পর ফুটে ফুটে ওঠে হাতি ঘোড়া হরিণ লুডোর ছক। কখনও বিবেকান্দ, বিদ্যাসাগর, পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ। যার দাম বেশ বেশি। বাইশ ত্রিশ বা চল্লিশ হাজার অবধি। শঙ্করী দে এরম একটি পাটিতে দুটি হরিণের মোটিফ বুনে বিক্রি করেছেন এক লক্ষ টাকায়। আয়ও বেশ হয় এতে। মাসিক কুড়ি পঁচিশ হাজার টাকা ওদের আয় হয়েই যায়। ওতেই চলে সংসার। বেতের ছালকে রোদে শুকিয়ে তৈরী করা হয় বাদামী রঙের পাটি। আবার জলে সিদ্ধ করলে তার রঙ হয় সাদা। মহিলাদের আঙুল-খেলায় তৈরী হয় কমলকোষ, ভূষণাই, বুকা পাটি, শীতলপাটি, ডালার পাটি। পাটি বুননের নানা ধরন আছে। দুটো বা তিনটে ফালি নিয়ে ত্যারচা ভাবে যে বুনন হয় তাকে বলে দোগাছা

বা তিনগাছা বুনন। আবার ঘন বুনন হলে তাকে বলে ঘুসনাই বুনন। সোজাভাবেও ফালিকে রেখে বোনা যায়। ভূষণায় কমলকোষ পাটি বোনার কাজটা অবশ্য বেশ সূক্ষ, মসৃন, দৃষ্টিনন্দিত। যার সাহায্যে পাটির উপর নানা মোটিফ তোলা হয়। মোটিফ ছাড়া সাধারণ শীতলপাটির দাম হয়ে থাকে ১২০০/- থেকে ৩০০০/- টাকা। গাছের ছাল, মহিলাদের হাতের কারুকাজ, তাদের নিবিড় মনোযোগ, সকাল সন্ধ্যার পরিশ্রমে গড়ে ওঠে শীতলপাটি। যার উপরে শান্তিতে ঘুমিয়ে পরি আমরা। শিল্পীর খোঁজখবর না নিয়ে শিল্পজাত দ্রব্যটিকে অধিক মূল্য দিই আমরা!

দেশ বিদেশে পাটির কাজ নিয়ে নানা কর্মশালা হচ্ছে। রাজ্য জাতীয় স্তরে হচ্ছে মেলা। UNESCO, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যন্ত এই কাজে যুক্ত আছে। তথাপি বাস্তব ক্ষেত্রে পাটির কাজ কমছে বই বাড়ছে না। তাছাড়া কম দামের প্লাস্টিক মাদুর এসে গেছে বাজারে। আছে মেদনীপুরের মাদুর। তবুও কোচবিহারের শিল্পীরা এই কাজটি আজও করছে। যার মূলমন্ত্র ধরা আছে মহিলাদের হাতে। সকাল সন্ধ্যা রাতে যেসব মহিলারা দিনাতিপাত করে পাটির কাজে, সে শিল্পের ভবিষ্যৎ কি? যদি নতুন মেয়েরা এই শিল্পে না আসে, যদি সরকারি উদ্যোগের ব্যাপক প্রয়োগ-সম্প্রসার না ঘটে, তাহলে তা অবশ্যই চিন্তার। দক্ষ অভিজ্ঞ মহিলা শিল্পীরা বয়স্ক হচ্ছে দিনদিন। তাদের কাছে কমলকোষ বা ভূষনাই-এর সূক্ষ্ম কাজটি যদি নতুন মেয়েরা না শিখে নেয় তাহলে কিন্তু পাটি শিল্পের ভবিষ্যৎ সঙ্কটের মুখ দেখবে অচিরে। গোটা বঙ্গদেশের এই অনন্য শিল্পকর্মকে উজ্জীবিত করতে চাইলে নানা সংস্থারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। করতে হবে বাণিজ্যের সুব্যবস্থা। শীতলপাটি যে শোওয়া বা বিয়ের কাজ ছাড়াও চামড়া, প্লাস্টিক বা কাপড়ের নানা বস্তুর বিকল্প হতে পারে সে বিষয়ে জনসাধারণকে অয়াকিবহাল করতে হবে। চামড়ার মানি ব্যাগ, কাপরের ওয়াটার ব্যাগ, মোবাইল ব্যাগের পাশে পাটির সামগ্রী স্থান করে নিতে পারে অনায়াসে। যা দেখতে সুন্দর, টেকশই, ব্যবহার উপযোগী। আবার বর্ষাকালে পাটির কাজ কিছুটা কমে। স্থানীয় হাটে পাটি বিক্রি হলেও পাটির রপ্তানি অতটা হয়না সারাবছর। পরিদর্শক বা ভ্রমণপিপাসুরা খুব বেশি সংখ্যায় আসে না। বাড়িতে বসে অতটা বিক্রিও হয়না। ফোনে অর্ডার নিয়ে ক্যুরিয়ার করার ঝমেলা অনেক। মহাজনরা কিনলে শিল্পীরা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরকম নানা আভ্যন্তরিন সমস্যা আছে পাটি থেকে আয়ের পথে। সারা বছর হাতে গোনা কয়েকটি মেলা করে মহিলারা মুনাফার মুখ খুব একটা দেখে না দেখে না শঙ্করী দ, মালতী ধর, রীনা দে'র মতো শিল্পীরা। এসবও পাটি শিল্পের একটা অন্ধকার দিক। তবে কয়েকটি পাটিশিল্প সমবায় সমিতি একাজে আজও লেগে আছে। তবে সেখানে শিল্পমান নিয়ে অতটা তৎপরতা নেয়। যতটা আয়ের দিকে আছপ নজর।

এসবের মাঝেও টগর রাণীর মতো রাষ্টপতি পুরস্কার প্রাপ্ত (বা রাজ্যস্তরে বিউটি দে দেবনাথ) মহিলা পাটি শিল্পী আজও স্থানীয় মহিলাদের কাজ শেখায় মাঝেমাঝে। টগর রাণীর ঘরেই কাজ শেখে এলকার আগ্রহী মহিলাদল। ওরা শেখে ত্যারচা বা সোজা বুনন। মাপ জোক। সূক্ষ্মতা, মসৃণতা বজার রাখা প্রভৃতি কাজ ওরা শেখে টগর দেবীর কাছে। তবে

আজকাল স্থানীয় মেয়েরা আর কাজ শিখতে আসে না সেভাবে। নানা সংস্থা এসে শিল্পীদের নানা তথ্য নিয়ে চলে যায়। তার খুব একটা সুফল পায়না ওরা। তবুও পেটের দায়ে, রোজগারের তাগিদে মহিলারা আজও বানিয়ে চলেছে শীতল পাটি, সাধারণ পাটি, ব্যাগ। নতুন মেয়েদের এ-কাজে না টানলে এই শিল্প কতোদিন টিকবে বা টিকলেও তার ঐতিহ্য-গুণমাণ কতটুকু বজায় থাকবে তা জানে শুধু ভবিষ্যৎ। কল্পনা, বীণা, চপলা নামের মহিলা শিল্পীরাও এ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত। অন্যদিকে আধুনিক কালে নানাভাবে আয়ের নানা উৎস থেকে পাটি শিল্পের দিকে অভিমুখ ঘোরানোটাও বেশ সমস্যার। যদিও কিছু কিছু মহিলা, পাটি শিল্পের সাম্প্রতিক দৃশ্য দেখে আশ্বস্ত হয়ে আছে। শিল্পের ভবিষ্যত-ছবিটি তারা কল্পনা করতে পারছে না। নতুন মেয়েরা সরকারি চাকরির ইঁদুর দৌড়ে না গিয়ে, যদি পাটিশিল্পকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে তাহলে ক্ষতি কি! বেসরকারি সংস্থায় কাজের থেকে যে আয় হতে পারে মেয়েদের তার থেকে ঘরে বসে পাটিশিল্প থেকে আয়টা বেশি তো কম নয়। তাতে শিল্প-ঐতিহ্য বাঁচবে আবার আয় প্রতিয়োগীতার যন্ত্রণা থাকবে না। কিন্তু এই সহজ পন্থাটি কি আধুনিক যুবতীরা গ্রহণ করবে?